

বেলা ফুরাবার আগে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পুলিশি লাঞ্ছনা ও পশ্চাৎ ইতিহাসের অচেনা বাঁকে

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

পুলিশি লাঞ্ছনা ও পশ্চাৎ ইতিহাসের অচেনা বাঁকে

পুলিশ জনগণের বন্ধু। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আপদ-বিপদের সাথী। এ ধারণা বাংলাদেশে ক্রমেই ম্লান হতে চলেছে। বিপদের সাথী দ্বারা এত বেশিমাাত্রায় বিপদ সংঘটিত হচ্ছে, যাতে করে এধরনের ঘটনার চাঞ্চল্যতাও হারাতে বসেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আগে এধরনের একটি ঘটনাই গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ইতিহাস সচেতন যারা তারা নিশ্চয় ভুলে যাননি ১৯৯৪ সালের ২৫ আগস্ট পুলিশ কর্তৃক উত্তরবঙ্গের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা।

ইয়াসমিনের এই ঘটনা সেদিন শুধু পুলিশ ব্যারাককেই প্রকম্পিত করেছিল তাই নয়, ক্ষমতাসীনদের মসনদকেও করেছিল টালমাটাল। কিন্তু খাবারের আধিক্যে যেমন রুচি পড়ে যায়, শোকে শোকে পাথর, তেমনি ভয়ংকর এসব ঘটনার আধিক্য দ্বারা মানুষের ঘৃণাবোধেও এসেছে সহিষ্ণুতা। তাই আগের মতো আর বিক্ষুব্ধ হয় না জনগণ, প্রতিবেশি মেয়েটার সর্বনাশেও বিগলিত হয় না মন! বস্তুত মানুষের ভাবনা যতই নিজ স্বার্থে সংকুচিত হচ্ছে, সমাজে পাপের ভয়াবহতা ততটাই সর্বত্র সংক্রমিত হচ্ছে। এই সংক্রমণের প্রভাব অন্য দশজনের মতো নাগরিকদের নিরাপত্তা ও নারীর ইজ্জত রক্ষার যিস্মাদার পুলিশের মধ্যেও ছ ছ করে বাড়ছে।

কিছুদিন আগে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কত ভয়ংকর তথ্য চিন্তা করা যায়! যে শিশু একজন পুলিশের কাছে পিতার মমতায় নিরাপত্তা লাভ করার কথা, দরিদ্র নাগরিকদের ঘর্মাক্ত উপার্জনের বিরাট অংশ দিয়ে পুলিশকে অস্ত্র দেয়া হয়েছে নাগরিকদের সম্মন বাঁচানোর জন্য সেই অস্ত্রই তাক করা হয়েছে খোদ নাগরিকদের বিরুদ্ধে! তাও বড়-বয়স্ক কেউ নয়; একজন শিশুর বিরুদ্ধে!

সংশ্লিষ্ট পুলিশকে গ্রেফতার ও তার দায়িত্ব প্রত্যাহার করা হয় বটে, কিন্তু এ ধরনের গ্রেফতার এবং প্রত্যাহার করার পদক্ষেপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মনে হলেও পরবর্তীকালে অভিযুক্তের জন্য এটাই পুরস্কার বা খালাসের সূচক হয়ে ওঠে। কারণ, এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হয় কিংবা এতই মন্তর গতিতে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা চূড়ান্ত বিচারে শিষ্টের দমন ও দুষ্টির পালনে রূপ নেয়।

মুন্সিগঞ্জের ঘটনায় ষষ্ঠ শ্রেণির এই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ দৃশ্যত সত্য প্রতিভাত হওয়ার পরও সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া একটি অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। দেশের প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষ দিন দিন আস্থা হারাচ্ছে। এর একটা বড় কারণ, বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গ্রেফতার, জামিন নামঞ্জুর ও রিমান্ডের মতো চটকদার হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিবেক বলে আলামত সংগ্রহ, রিমান্ড আবেদন ইত্যাদির জন্য সময়ক্ষেপন না করে বরং অভিযুক্তের সাত দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা জরুরী। নাগরিকদের সম্মনরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে

সম্ভ্রম ধ্বংসের এসব ঘটনায় আমরা বিচার চাই, রিমান্ড চাই না।

মুদ্রার অপর পিঠ

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া থাকে। এটা সর্বজনবিদিত তথ্য। বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের দায়িত্বশীল, যাদের হাতে সাধারণ নাগরিকের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার কুঞ্জি তুলে দেয়া হয় তারা যদি নাগরিকদের সঙ্গে খেয়ানত করেন তবে ওই সমাজে পাপাচার ও অন্যায়ের প্রবণতা বানের পানির মতো ছ ছ করে ঢুকে পড়ে। শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গুলিস্তা গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার জনৈক বাদশা তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভ্রমণে বের হলেন। ভ্রমণ বিরতিতে খাবারের আয়োজন করা হলো। কিন্তু খেতে বসে দেখা গেলো সঙ্গে লবণ আনা হয়নি। সৈন্যরা বললেন, এ আর কি সমস্যা? আশেপাশের কোনো বাড়ি থেকে একটু লবণ নিয়ে আসি। বাদশা ওই সৈন্যকে নিবৃত্ত করলেন এবং বললেন, আজ বাদশা যদি তার প্রজার বাড়ি থেকে এক চিমটি লবণ আনে তবে পরেরদিন সৈন্যরা গরু ধরে আনবে! বাদশা বড় বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। তিনি মানব প্রকৃতির নাড়ি-নক্ষত্রও ভালো করে রপ্ত করেছিলেন। তাই পাপ বিস্তারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ধরন ভালো করেই জানতেন।

বাদশার দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন- ক্ষমতাশীলরা ছোটো অন্যায় করলে অধীনস্তরা বিপুল উৎসাহে এরচেয়ে বড় পাপে লিপ্ত হবে। জানি না, শেখ সাদী রহিমাহুল্লাহর উল্লিখিত ওই বাদশা মহোদয় কতদিন আগে রাজ্যশাসন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার শতভাগ বাস্তবায়ন সুদূর বাংলাদেশে বসে আমরা নিত্যনতুন রূপে প্রত্যক্ষ করছি। তাই তো যে পুলিশ বাহিনীর কাজ ছিল নারীদের ইজ্জত-আব্রু হেফায়ত করা, তাদের কারো কারো দ্বারা সেই ইজ্জত-আব্রু দলিত হওয়ায় দেশে বিপুল উৎসাহে এই অপকর্ম বেড়ে গেছে। কিন্তু কামারের লোহার বাড়ির আঘাত যেমন সবার আগে তার কানকেই স্পর্শ করে ঠিক তদ্রূপ যারা পাপ ও অনাচার বন্ধের দায়িত্বশীল হয়েও যারা তা বন্ধ করার পরিবর্তে নিজেরাই তাতে জড়িয়েছেন তারাও শিকার হচ্ছেন এর নির্মম পরিণতির। এমনই এক নির্মমতার শিকার এক ফুটফুটে সুন্দরী কিশোরী মারজানা।

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার চরচালা গ্রামের শাহ আলমের ভাগ্নি আব্দুল মান্নানের মেয়ে মারজানা আক্তার ফাতেমা নিজ গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী। চাচা রফিকুল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার এসআই। তিনি সপরিবারে বসবাস করেন বাহুবল থানার কনস্টেবল কোয়ার্টারের দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটে। ঘটনার কয়েকমাস আগে মারজানা তার চাচার বাসায় আসে লেখাপড়া করার জন্য। সুন্দরী তরুণীর ওপর কুনজর পড়ে একই ভবনের বাসিন্দা কনস্টেবল রুহুল আমীনের ছেলে ফাহাদ হোসেন এবং বেতার কনস্টেবল আব্দুল কাদেরের ছেলে মাসুমের। তারা তাকে সময়ে অসময়ে উত্যক্ত করতে থাকে। বিষয়টি মারজানা তার চাচা, চাচি, মামা ও মা-বাবাসহ আত্মীয়স্বজনদেরকে অবহিত করেন। এদিকে চাচা রফিকুল ইসলাম বদলি হয়ে চলে যান সিলেটের গোয়াইনঘাট থানায়। মারজানা বাসায় থেকে যান।

নিজ দেশ ছেড়ে সিলেটের ভূমিতে লেখাপড়া করতে আসা মারজানার জন্য চরম দুঃখ অপেক্ষা করছিল ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের দিনটি। ওই দিন রাত দশটার দিকে বিদ্যুতের লোডশেডিং শুরু হয়। ভ্যাপসা গরম থেকে রক্ষা পেতে চাচি কামরুন্নাহার কল্লনা কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে নিচে আঙিনায় পায়চারী করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজায় মাসুমকে দেখতে পান। বাসার ভেতরে মারজানার চিংকার শুনে তিনি বাসায় প্রবেশ করে দেখতে পান বাসা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি মাসুমকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কামরুন্নাহার ডাকাডাকি করলে ফাহাদ দরজা খোলে। তাকে সম্পূর্ণ এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান কল্লনা। ভেতরে গিয়ে তিনি দেখতে পান মারজানা অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বাথরুমে প্রবেশ করছে।

কামরুল্লাহর অনেক ডাকাডাকি করে মারজানাকে বাথরুম থেকে বের করে আনেন। এসময় তিনি মারজানার গালে কামড়ের দাগসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের অসংখ্য চিহ্ন দেখতে পান। ঘরের মেঝে ও বিছানায় মারজানার অন্তর্বাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেন তিনি। মারজানা জানায়, বিদ্যুৎ না থাকায় খারাপ উদ্দেশ্যে ফাহাদ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাসুম পাহারা দেয়। এসময় ফাহাদ জোর করে মারজানাকে ধর্ষণ করে। কামরুল্লাহর ঘটনার পর স্বামীকে অবহিত করেন।

পাঠক! পুলিশি পরিবারের পাশবিকতার এখানে শেষ নয়। এই পর্যন্ত যা ঘটেছিল তা খুবই নির্মম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর আরো যা ঘটেছিল তা আর আর যাই হোক, কোনো সভ্য সমাজের কাজ বলে মেনে নেয়া যায় না। আমরা ইতিহাসের অনেক ঘটনা সম্পর্কে জানি, যা শুধু শ্রুতিমধুরতার জন্য বলা হয় না, যুগ যুগ ধরে তা শিক্ষাপাথেয় হয়ে মানুষের বিবেকের দুয়ারে করাঘাত করে।

ইতিহাসের অমর নায়ক হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইবরাহিমী খড়্গহস্তে আবির্ভূত অপ্রতিরোধ্য সুলতান মাহমুদ গজনবী রহিমাল্লাহর নাম শোনেননি এমন ব্যক্তি খুঁজে বের সহজ হবে না। তিনি ইতিহাসের হাজারও অমর ঘটনার নায়ক হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে অতি আপন হয়ে আছেন। মজলুম নারীদের চোখে আপন হয়ে আছেন চরিত্র ও সতীত্বের দুশমনদের বিরুদ্ধে আপোসহীন যোদ্ধার ভূমিকার কারণে।

একবার এক বৃদ্ধ পৌড় প্রজা আসলেন তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে। তিনি বললেন, মাননীয় সুলতান! আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়ে আপনার দরবারে আগমন করেছি। আপনার ভাগ্নে আমার কন্যার ইজ্জত হরণ করতে উদ্যত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটার ইজ্জত বাঁচিয়েছি আমরা। কিন্তু হয়ত সম্ভব হবে না তা। আবার হানা দেয়ার হুমকি দিয়ে সেদিনের মতো চলে গেছে সে। আশঙ্কা করছি খুব শীঘ্রই আবার হানা দেবে ও...

প্রজার অভিযোগ শুনে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠলেন ইতিহাসের এই অমর নায়ক, অকুতোভয় সাহসী সুলতান গজনবী। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদরক্ষীদের ডেকে বললেন, এই লোকটাকে চিনে রাখো। বৃদ্ধা যেদিন, যে সময় এবং যত রাতেই আমার কাছে আসুক, বিনা বাধায় তাকে আমার কাছে পৌঁছতে দেবে।

এরপর সুলতান লোকটিকে বললেন, যদি কোনোদিন সে আবার হানা দেয় তবে দেখলেন তো আমি প্রহরীদের বলে রেখেছি বিলম্ব না করে আমার কাছে চলে আসবেন।

নিরুপম রাত। রাতের গভীরতায় প্রজাকুল নিদ্রাকোলে শায়িত। এই গভীর রজনীতে হঠাৎ সুলতানের খাসকামরায় বিশেষ প্রহরীর মৃদ করাঘাত শোনা গেল। হস্তদন্ত সুলতান বের হতেই প্রহরী সালাম দিয়ে জানালো, মুহতারাম সুলতান! ওইদিনের সেই লোকটি এসেছেন...

এরপর আর কিছু বলতে হলো না। সুলতান গজনবী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুতবেগে তার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন। বুকে তাঁর একটাই ভয়, আতঙ্ক- না জানি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব কিনা? উল্কাবেগে ওই মজলুম প্রজার আগে তার বাড়িতে পৌঁছলেন সুলতান। বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন লোকটির মেয়েটি বাঁচার জন্য কাকুতি মিনতি করছে, কিন্তু ক্ষিপ্ত যুবকের মন গলছে না তাতে। সে পাশবিক হিংস্রতায় পরম সুন্দরী ওই কন্যাকে স্পর্শ করতে চাইছে। রাতের আঁধারে কালবিলম্ব না করে মহামহিম সুলতান খাপ থেকে তলোয়ার বের করে মুহূর্তের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন পাপোদ্ধত যুবকের মস্তক। এরপর আলো জ্বালিয়ে মস্তক দ্বিখণ্ডিত যুবকের চেহারায় ঘৃণা ভরে নজর বুলালেন। নজর বুলাতেই সুলতানের চেহারায় আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো। তিনি উচ্চস্বরে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন এবং ওই লোকটির কাছে পানি চাইলেন।

কৃতজ্ঞতায় ওই পৌঁড়ের হৃদয় আনন্দে দুলাছিল। তার মতো এক ক্ষুদ্র প্রজার বাড়িতে সুলতান এসেছেন, পানি পান করতে চাচ্ছেন, এসব কথা ভাবতেই তার বুকটা আনন্দে আরেকটু বড় হয়ে গেলো। তিনি দৌড়ে পানি আনতে গেলেন। সুলতান শীতল পানি পান করে আবার আলহামদুলিল্লাহ বললেন। মেয়েটির বাবা কম্পিত বুকে সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেন, সুলতানে আলা! যদি অনুমতি দেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি। সুলতান তাকে নির্ভয়ে তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করলে লোকটি বললেন, মহামান্য সুলতান! আমি লক্ষ্য করেছি আপনি যুবকটির মাথা দ্বিখণ্ডিত করে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হলেন এবং হত্যা করেই পানি পান করলেন...

সুলতান বললেন, শোনো, তুমি যেদিন বলেছিলে আমার ভাগ্নে তোমার কন্যার ইজ্জত হরণ করতে চায় তখনই আমার সারা শরীরে ক্ষোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানের আপনজন হয়ে সে এত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার কন্যার ইজ্জতের ওপর আঘাতকারীর ফয়সালা না করে ক্ষান্ত হবো না এবং এক ফোঁটা পানিও পান করব না। আমার ভয় ছিল হতে পারে আমার ভাগিনা এই কাজটি করতে পারে। তাই তাকে হত্যা করে তার চেহারা দেখে নিশ্চিত হয়েছি আমার পরিবার বা আপনজনদের কেউ এই ঘৃণ্য পাপে জড়িত নয়। যুবকটি আসলে অন্য কেউ। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। আর পানি পান করলাম, কারণ তুমি বিচার দায়ের করার পর থেকে আজ পর্যন্ত পানি পান করিনি আমি। প্রচণ্ড পিপাসার্ত ছিলাম, এখন পিপাসা নিবারণ করলাম।

ভারতবাসীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভয়ানক ও আতঙ্কিত শাসকের নাম এই সুলতান গজনবী। তিনি হিন্দুদের সবচেয়ে তীর্থস্থান সোমমন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা ছিল হিন্দুদের দৃষ্টিতে অপারাজেয় এবং দুর্ভেদ্য। তা ভারতবাসী আজো ভুলতে পারে না সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথা। কিন্তু তবু কালের মহাকাব্যিক ইতিহাস রচনা করে সগৌরবে খোদ ভারতবাসীর মনে স্মরণীয় হয়ে আছে সুলতান গজনবীর নাম। এই ইতিহাস একজন বিশ্বখ্যাত মুসলিম শাসকের শুধু ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষীই নয়; মজলুম নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করারও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-আখ্যান হিসেবে দেদীপ্যমান।

গল্পে গল্প বাড়ে, বিশ্লেষণে আসে পশ্চাত ইতিহাসের মহাকাব্য। তাই জনগণের ঘামের টাকায় বেতন-ভাতা দেয়া এদেশের মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার পুলিশদের দায়িত্ব কী হওয়া দরকার এবং যাদের হাতে প্রজাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব তারা কীভাবে ইতিহাস সামলেছেন এবং মজলুম নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন তার উদাহরণ দিতে গিয়ে ঘটনাটি তুলে ধরলাম। এবার আসি আমাদের মূল প্রসঙ্গে।

সন্তানদের দ্বারা একদফা লাঞ্ছিত হওয়ার পর মারজানার ভাগ্যে জোটে তাদের পিতাদের দ্বারা ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিত হওয়ার পালা। দুই কনস্টেবলের ছেলে মাসুম ও ফাহাদকে ঢেকে নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির করেন থানার ওসি আজিজুর রহমান সরকার, এসআই ওয়াহিদুর রহমান, কনস্টেবল রুহুল আমীন (ফাহাদের বাবা) এবং কনস্টেবল আব্দুল কাদের (মাসুমের বাবা) ও দুলাল। সবার উপস্থিতিতেই ওসি-দারোগার জিজ্ঞাসাবাদ চলে ধর্ষিতাকে। কুরুচিপূর্ণ, বিব্রতকর ও আপত্তিকর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয় মারজানাকে। এসময় তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ধর্ষিতার স্পর্শকাতর স্থান স্পর্শ করে শারীরিক নিপীড়ন করে। এক পর্যায়ে আজিজুর রহমান সরকার চা খাওয়ানোর কথা বলে মারজানার চাচিকে রান্নাঘরে পাঠায়।

এ সুযোগে আজিজুর রহমান সরকার ও ওয়াহিদুর রহমান মারজানাকে ছাদে নিয়ে যায়। সিঁড়িতে পাহারায় রেখে যায় রুহুল ও দুলালকে। কিছুক্ষণ পর কামরুন্নাহার ছাদে উঠতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। তিনি বাধা ডিঙিয়ে

উপরে উঠে দেখতে পান আজিজুর রহমান ও ওয়াহিদুর রহমান জিজ্ঞাসার নামে মারজানাকে লাঞ্ছিত করছে। এতে তিনি তাদেরকে বাধা দিলে তারা তাকে ধমক দেয়। একপর্যায়ে আজিজুর রহমান ধর্মণের আলামত দেখতে মারজানার কাপড়-চোপড় খুলতে চাইলে তা ছিঁড়ে যায়। এ অবস্থায় নিজের অবশিষ্ট সম্ভ্রম বাঁচাতে মারজানা ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েন। আহত অবস্থায়ও মারজানার চিকিৎসা নিয়ে টালবাহানা করে মানুষ নামের এই পশুগুলো। ফলে মারজানা হাসপাতালেই মারা যান।

আসলে কালের আবর্তনে ভুলের সংজ্ঞা বদলায়; যেমন ভঙ্গ দর্পণে চেহারার রূপ পাণ্টে যায়। তাই বলতেই হচ্ছে, ওসি আজিজুর রহমান সরকার, এসআই ওয়াহিদুর রহমান, কনস্টবল রুহুল আমীন (ফাহাদের বাবা) এবং কনস্টবল আব্দুল কাদের (মাসুমের বাবা) ও দুলাল ভুল করেনি (?), করেছেন মারজানা! কেন তিনি বিচার দিতে গেলেন? তিনি কি জানেন না, এটা সুলতান মাহমুদের জামানা নয়? এখানে বাস করে ঘাতক, খাদক আর পাষাণদের দল? এখানে নির্যাতন করা যতটুকু অপরাধ, নির্যাতিত হওয়া তারচেয়েও বেশি অপরাধ! এখানে নির্যাতকের শাস্তি নিশ্চিত নয় কিন্তু নির্যাতিতার শাস্তি অবধারিত! মানবরচিত আইনের খবর ও দেয়ালে নির্যাতিতাদের ভাগ্যের লিখন পাঠ করতে জানেন না বলেই মারজানাদের এই দুঃখ!

তাই তিনি অপরাধীদের অভিভাবকদের কাছে বিচার পাওয়ার আশা করে হয়েছেন আশাহত, বঞ্চনাকে ভেবেছেন সান্ত্বনা এবং উপহাসকে ভেবেছেন বিচার বলে। শুধু তিনিই উপহাসের পাত্রী হননি, যে ভারতে পরধর্মের একজন নারীর ইজ্জত বাঁচাতে অত্যন্ত প্রত্যাশালী শাসক অপরাধের সাজা না হওয়া পর্যন্ত পানি পান না করার শপথ নিয়ে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই ভারতে এখন কোনো নারীর ইজ্জতও সংরক্ষিত নয়। এমনকি বিচারকদের দ্বারাও অহরহ সংঘটিত হচ্ছে নারী নির্যাতনের ঘটনা।

১৩ নভেম্বর ‘১৩ সালের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের খবরে প্রকাশ, হিন্দুস্তানের এক তরুণী একজন বিচারপতি কর্তৃক দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এটা সাধারণ একটা ঘটনা। হিন্দুস্তান এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্মণের শিকার নগরীতে পরিণত হয়েছে। আমরা কেবল মুসলিম শাসকদের ইনসাফের স্মৃতিটুকুই পাঠ করি। কিন্তু শিক্ষা নিই কতটুকু? কেন কয়েম করতে পারি না এমন সমাজ, যেখানে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান হবেন ধর্মিতার জামিন, তার রক্ষাকবচ ও ইজ্জতের আমানতদার?

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10591>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন